বাংলা অনুবাদে ইয়েটসের নাটক

শীর্ষেন্দু মজুমদার

'Two factors basically determine the image of a work of literature as projected by a translation. These two factors are... the translator's ideology... and the poetics dominant in the receiving literature at the time the translation is made'[১]

'...[A] translation comes later than the original, and since the important works of world literature never find their chosen translators at the time of their origin, their translation marks their stage of continued life.'[২]

'The proper domain of the translator is... to be found in the vast mass of feeling, passion, interest, action and habit which is common to mankind in all countries and in all ages; and which, in all languages, is invested with its appropriate forms of expression, capable of representing it in all its infinite varieties, in all the permanent distinctions of age, profession and temperament, which have remained immutable and of which the identity is to be traced almost in every page of the author before us.'[৩]

আমরা সর্বশেষ উদ্ধৃতিটি দিয়ে শুরু করব। ১৮২০তে এই কথাগুলি লিখেছিলেন John Hookham Frere, T. Mitchell-এর Aristophenes-এর কয়েকটি নাটকের অনুবাদের সমালোচনার প্রসঙ্গে। পরে Frere নিজেও Aristophanes-এর চারটি নাটক অনুবাদ করেন এবং এই অনূদিত নাটকের সংকলন প্রকাশিত হয় Oxford World's Classics Series-এ। এই উদ্ধৃতি অনুবাদকের ভূমিকা নিয়ে সার্বিক সিদ্ধান্ত। Frere তাঁর সমালোচনামূলক নিবন্ধে দু' ধরনের অনুবাদকের কথা বলেছেন — Faithful translator এবং Spirited translator। এই Faithful translator কী করেন? তিনি কোনও ধরনের ব্যক্তিগত বিচার ব্যবহার করেন না। তিনি host language-এর ভাষার তৎকালীন যে ব্যবহারিক প্রথা সেগুলিকে অগ্রাহ্য করেন, খুব একনিষ্ঠভাবে source text-এর 'local and personal peculiarities' বজায় রাখেন এবং allusion-এর ক্ষেত্রে দীর্ঘ টীকার দ্বারা পাঠককে শ্রান্ত করেন। কাজেই Frere এই Faithful translator-এর বদলে Spirited translator-কে বেশি পছন্দ করছেন, কারণ তাঁর অনুবাদের ভাষা সাবলীল এবং সমকালীন, যেখানে পাঠককে হোঁচট খেতে হয় না বা অনূদিত পাঠটি তার স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে। এক্ষেত্রে বলা চলে যে, Faithful translator-এর ideology হল তাঁর মূল পাঠের প্রতি

শ্রদ্ধা এবং মূল লেখকের মর্যাদা যত বেশি, তাঁর আনুগত্যও তত বেশি। অন্যদিকে Spirited translator সেভাবে রক্ষণশীল নন। তিনি অনেক লিবার্টি নেন, যাতে অনূদিত পাঠের ভাষা ও শৈলী সমকালীন হয়। এবং এর ফলে মূল পাঠের মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রেই হ্রাস পায়। এইসব কথা Andre Lefebre, যাঁর উদ্ধৃতি আমরা প্রথমেই দিয়েছি, তিনিই বলেছেন। তবে Lefebre একটি কথা বলেননি; সেটি হল Spirited translator-এর অনুবাদ কীভাবে আধুনিক পাঠকের কাছে একটি পাঠকে অনেক বেশি সজীব ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

আমরা এতক্ষণ যেসব কথা বললাম সেগুলি মূলত প্রাচীন ইউরোপীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদ, বিশেষ করে, ইংরেজিতে অনুবাদের প্রসঙ্গেই বললাম। তাহলে প্রশ্ন আসে যে, আধুনিক ইউরোপীয় তথা ইংরেজি থেকে মর্যাদাপূর্ণ কোনও টেক্সটকে বাংলার মতো একটি আঞ্চলিক (যদিও বাংলা অন্য একটি দেশের জাতীয় ভাষা) ভাষায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে অনুবাদের কোন ধরনটি প্রযোজ্য হবে? এই প্রশ্নটি আরও বেশি করে আমাদের বর্তমান ক্ষেত্রে উঠে আসে কারণ আইরিশ কবি ও নাটককার উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯) ছিলেন মূলত কবি। আইরিশ লিটারারি রিভাইভ্যালের ক্ষেত্রে নাটক ছিল অন্যতম সাংস্কৃতিক মাধ্যম। ১৯০৪-এ এ্যাবি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করে ইয়েটস, লেডি গ্রেগরি, এডওয়ার্ড মার্টিন-রা আইরিশ আধুনিকতার ভিত স্থাপন করেন। সেদিক থেকে দেখলে ইয়েটসের নাটকের অন্যরকম একটি মাত্রা আছে। এছাড়া আমাদের স্মরণ করা উচিত যে, এ্যাবি থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর ইয়েটস নাটক নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন Samhain পত্রিকায় (উচ্চারণ সৌওইন)। একটি প্রবন্ধের শেষে লিখেছিলেন : ‘In Ireland, where the tide of life is rising, we turn, not to picture-making, but to the imagination of personality.’ অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর নাটককারসত্তার ভাবনা প্রকাশ করেছেন খুব আন্তরিকভাবে : ‘I want to create for myself an unpopular theatre and an audience like a secret society where admission is by favour and never to many.’[৪] এর প্রায় পনেরো বছর পর ইয়েটস *The Only Jealousy of Emer* নাটকের টীকায় আরও বিশদভাবে তাঁর নাটক লেখার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেন :

> While writing these dance plays [*The Dreaming of the Bones* এবং *The Only Jealousy of Emer*], intended for some fifty people in a drawing room or a studio, I have rejoiced in my freedom from the stupidity of an ordinary audience... In writing these little plays I knew that I was creating something which could only fully succeed in a civilization very unlike ours. I think they should be written for some country where all classes share in a half-mythological, half-philosophical folk-belief, which the writer and his small audience lift into a new subtlety.[৫]

বাস্তবিক অর্থে ১৯১৭ সালে Ernest Fenollosa-র অনূদিত জাপানি নোহ্ নাটক ইয়েটসকে এক নতুন ধরনের নাটকের ভাবনা এনে দেয় যা তাঁর পরবর্তীকালে নাটকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে; সে কথা তিনি একাধিকবার স্বীকার করেছেন তাঁর লেখায়। এই প্রভাব আত্মস্থ করা ইয়েটসের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কারণ তিনি এক নতুন নাট্যশিল্পের সন্ধানে ছিলেন যেখানে ভাষ্য ও সংগীত ওতপ্রোত জড়িত। কিন্তু এসবের উপরে ছিল তাঁর নাট্যকারের instinct। সে কথা তিনি নিজের মুখেই বলেছেন : ‘I need a theatre, I believe myself to be a dramatist; I desire to show events and not merely to tell of them?’[৬] আমাদের হয়তো কিছুটা অবাক লাগবে এটা ভাবলে যে, ১৯২৩-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর যে বক্তৃতা তিনি দেন সেখানে তিনি কারও কারও মতো নিজের বড় হয়ে ওঠার

কথা বা পরিবারের কথা বলেননি। বলেছেন আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কথা এবং এই আন্দোলনে যাঁরা ছিলেন তাঁর প্রধান সঙ্গী — লেডি গ্রেগরি ও জন মিলিংটন সিঙ্গের কথা — এবং আইরিশ নাট্য আন্দোলনে এই দুজনের অপরিহার্য ভূমিকার কথা। বক্তৃতার গোড়াতেই তিনি বলেছেন নাটকের প্রতি তাঁর সহজাত প্রবৃত্তির কথা : 'Perhaps the English committee would never have sent you my name if I had written no plays, no dramatic criticism, if my lyric poetry had not a quality of speech practised upon the stage.'[৭]

২

আমরা দেখলাম যে ইয়েটসের নাটক ও শ্রোতা নিয়ে যে ব্যক্তিগত মত সেগুলি পপুলার থিয়েটার বলতে যা বোঝানো হয়, সেরকম নয়। সে কথা তিনি 'A People's Theatre' (১৯১৯) প্রবন্ধে লিখেছেন। আমরা ইয়েটসের যে চারটি নাটকের বাংলা অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করব সেগুলি অন্যদিক থেকে গভীর তাৎপর্যসম্পন্ন হলেও খুব একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেনি যেমন করেছিল *Cathleen ni Houlihan* (১৯২০, Lady Gregory-র সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত) বা *The Counltess Cathleen* (যে নাটক ভীষণ বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল)। ১৯১৩ সালে Urbana-তে রবীন্দ্রনাথ *Cathleen ni Houlihan* ও অন্যান্য নাটক দেখে খুবই আপ্লুত হয়ে ইয়েটসকে লিখেছিলেন : 'I cannot tell you how deeply moved I was, particularly by "Cathleen ni Houlihan". Its effect is still haunting me.'[৮] রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত (অবশিষ্ট) সংগ্রহে অবশ্য *The Hour-Glass* ছাড়া অন্য কোনও নাটকের হদিস মেলে না। রবীন্দ্রনাথের ইয়েটসের নাটক দেখার অবশ্য কোনও প্রভাব বাঙালি মননে পড়েনি, বিশেষ করে *Cathleen ni Houlihan*-এর মতো দেশাত্মবোধক নাটক যেখানে তীব্র জাতীয়তাবাদ এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের আহ্বান আছে। নাটকটি লেখা ১৭৯৮-এ ফরাসি সাহায্যে আইরিশ বিদ্রোহ সংঘটিত করার পটভূমিকায় এবং সেখানে প্রধান নারীচরিত্র উপস্থিত হচ্ছে মাতৃভূমি আয়ারল্যান্ডের প্রতীক হিসেবে।

আমরা এই প্রবন্ধের গোড়াতেই অনুবাদের ideology এবং poetics-এর কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু ইয়েটসের যে নাটকটি প্রথম বাংলায় অনূদিত হয়েছে সেটি *The Land of Heart's Desire*। দ্বিজেশচন্দ্র সেন 'হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত দেশ' শিরোনামে নাটকটির অনুবাদ করে 'প্রবাসী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩২২-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করেন। শিরোনামের অনুবাদ যেমন আক্ষরিক, তেমনি অনুবাদককে অন্য কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি কারণ এটি একটি কল্পজগতের নাটক এবং এর পটভূমিকা প্রাচীনকাল। আইরিশ ও ভারতীয় প্রাচীনকালের দৈনন্দিন জীবন ও বিশ্বাসের মধ্যে অনেক মিল আছে; এছাড়া একাঙ্ক নাটক হওয়ার দরুণ বৃহৎ মঞ্চসজ্জারও কোনও প্রয়োজন হয়নি। অনুবাদক কেবলমাত্র কয়েকটি চরিত্রের দিশিকরণের মাধ্যমে নাটকটির একটি স্বাভাবিক বাংলা রূপ প্রদান করতে সফল হয়েছেন। মূল নাটকের আইরিশ চরিত্রের বদলে দ্বিজেশচন্দ্র এনেছেন নামহীন চরিত্র — কর্তা, গিন্নি, পুত্র, বধূ, গুরুঠাকুর-কে। মূলের সঙ্গে মিল কেবল পরিচালিকাটির। আমাদের হয়তো মনে পড়বে ব্রেখটের *Mr Puntila & His Man Matti*-কে শেখর চট্টোপাধ্যায় কেমন *পন্তু লাহা* নামে দিশিকরণ করেছিলেন। দ্বিজেশচন্দ্রের মধ্যে সেই ধরনের কোনও wit-এর ছটা নামের দিশিকরণের ক্ষেত্রে পাই না। বরং তিনি অনেকটা সাবধানতা অবলম্বন করেই মূল নামের রূপান্তর ঘটাননি। নাটক বা অন্যান্য যে কোনও অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল টেক্সটের ইতিহাস ঢাকা পড়ে যায় কারণ অনূদিত রূপ সেই ইতিহাস বহন করে না। কাজেই আমাদের দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে Walter Benjamin যে বলেছেন যে অনুবাদক বা অনুবাদ যে

কোনও সাহিত্যকর্মকে ‘continued life’ দেয়, সেই ‘continued life’ অনেকাংশে খণ্ডিত। একথা ইয়েটসের অন্যান্য নাটকের বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। *The Land of Heart's Desire* আইরিশ লোকগাথার উপর ভিত্তি করে লেখা। নাটকটি ইয়েটস লেখেন তৎকালীন বিখ্যাত মঞ্চ অভিনেত্রী ফ্লোরেন্স ফার-এর অনুরোধে। কিন্তু পরীরা এক অসুখী গৃহবধূকে তাঁর নিরানন্দ জীবন থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার লোককথার আড়ালে সুপ্ত রয়েছে ইবসেনের *A Doll's House* নাটকের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেটি বাংলা অনুবাদে কোনোভাবেই ফুটে ওঠেনি। তবে দ্বিজেশচন্দ্রের অনুবাদ আমাদের এই ইঙ্গিত দেয় যে ১৯১৫-তে ইয়েটসের কবিতা নয়, নাটকও বাঙালিকে কিছুটা টেনেছিল। এই সময়কালেই অজিতকুমার চক্রবর্তী আইরিশ কবি ও কবিতা এবং আইরিশ রিভাইভ্যাল নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধও লেখেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। কাজেই আইরিশ সাহিত্যে, বিশেষ করে ইয়েটসকে নিয়ে, কিছুটা উৎসাহ হওয়া স্বাভাবিক। সেদিক থেকে দ্বিজেশচন্দ্রের *The Land of Heart's Desire*-এর অনুবাদ আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তবে এই অনুবাদ *প্রবাসী* পত্রিকাতেই আবদ্ধ থেকেছে। জনমানসে এর প্রভাব ঘটার কোন চিহ্ন আমাদের কাছে নেই।

৩

ইয়েটসের জীবদ্দশায় আরও একটি নাটক অনূদিত হয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত *The Resurrection* নাটকটি *পুনরুজ্জীবন* নামে অনুবাদ করেন ১৯৩৬ সালে এবং *পরিচয়* পত্রিকায় এই অনুবাদটি প্রকাশিত হয়। ইয়েটস নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ করান ১৯৩৪-এর ৩০ শে জুলাই, যদিও ১৯৩১ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়। মূল নাটকের মুখবন্ধ সুধীন্দ্রনাথ কেন বাদ দিয়েছেন সে কথার কোনও ব্যাখ্যা তিনি দেননি। মূল নাটকের মুখবন্ধে ইয়েটস যে কথাগুলি লিখেছেন সেগুলির সারবস্তু হল যে তিনি এ্যাবি থিয়েটারের অপর একটি ক্ষুদ্র মঞ্চের কথা মাথায় রেখেই মঞ্চসজ্জার পরিবর্তন করেছিলেন। তাছাড়া তিনি নাটকটি নির্বাচিত দর্শকের জন্যই লিখেছিলেন। এমনকি তাঁর মনে হয়েছিল নাটকটির বিষয়বস্তু এমনই যে ইংল্যান্ড বা আয়ারল্যান্ড কোনোখানেই নাটকটি মঞ্চস্থ করার উপযোগী নয়। তবে অদ্ভুতভাবে ইয়েটসের যে চারটি নাটক বাংলায় অনূদিত হয়েছে; তার মধ্যে *পুনরুজ্জীবন*-ই একমাত্র যেটি মঞ্চস্থ হয়েছে ১৯৬৫-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে ইয়েটসের শতবর্ষ পালন উপলক্ষে। সুতরাং খুবই সীমিত এক পরিসরে নাটকটি দেখানো হয়।

ইয়েটস খ্রিস্টান ধর্মকে কেন্দ্র করে দুটি নাটক লেখেন — *Calvary* (১৯২১) এবং *The Resurrection* (১৯৩১)। কিন্তু ইয়েটসের খ্রিস্টধর্ম ভাবনাকে বুঝতে গেলে আগে বুঝতে হবে তাঁর নিজের সৃষ্টি করা ইতিহাসের এক অদ্ভুত ধারণাকে। ইয়েটস সভ্যতার ইতিহাসকে তাঁর নিজের কল্পনায় সৃষ্টি করেছেন এক চলমান বৃত্তের রূপে। এই বৃত্তের গতিশীলতারও অনেক খুঁটিনাটি আছে, আছে অনেক জটিলতা। সোজাভাবে একে বলা না গেলেও আমরা বলতে পারি যে ইয়েটস গ্রিক ও রোমান সভ্যতাকে দেখেছেন primary হিসেবে। Primary বলতে ইয়েটস বোঝাতে চাইছেন এমন সভ্যতা যেটি সম্মিলিতভাবাপন্ন এবং যার মধ্যে রয়েছে নৈর্ব্যক্তিক সত্যের অন্বেষণ। এই ধরনের সভ্যতাকে নৈর্ব্যক্তিক বলেই ইয়েটস চিহ্নিত করেছেন। এর বিপরীতে রয়েছে antithetical যার বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, আত্মবাদ, সৌন্দর্য এবং সৃষ্টিশীলতা। খ্রিস্টপূর্ব সভ্যতার নিয়মিত কালক্রম শেষ হওয়ার পর আসবে খ্রিস্টীয় সভ্যতা যা antithetical। এক্ষেত্রে ইয়েটস পাঠকদের ‘The Second Coming’ কবিতার কথা মনে পড়তে পারে। *Calvary* এবং *The Resurrection*-এ ইয়েটস নির্মিত কালক্রমের চক্রের প্রভাব ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। বিশেষ করে যখন দুটি ক্ষেত্রেই তিনি যিশুকে ঈশ্বর-মানব হিসেবে

দেখছেন। *পুনরুজ্জীবন*-এ আমরা দেখছি ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে মৃত্যুবরণ করছেন (life-in-death); অন্যদিকে মানুষ ঈশ্বরের মৃত্যুরূপ গ্রহণ করছে (death-in-life)। এই নাটকের বিষয়বস্তুর খুব সরলীকরণ সম্ভব নয়। তবে আমরা দেখছি যে নাটকের tension দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি বিপরীত চরিত্রের সন্ধিক্ষণে। একদিকে রয়েছে গ্রিক দেবতা ডায়োনাইসাস ও অন্যদিকে রয়েছেন যিশু। আমরা দেখছি যে ডায়োনাইসাসের নৃশংস মৃত্যু এবং তার বাৎসরিক পুনরুত্থান বা পুনর্জন্ম, যিশুর মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে আগাম সাদৃশ্যের বার্তা বহন করে। নাটকে দেখছি ডায়োনাইসাসের ভক্তদের উদ্দাম নৃত্য কেমনভাবে সেই বাড়িটির সম্মুখে এসে শান্ত হয়ে যাচ্ছে যেখানে তারা অনুভব করছে মৃত যিশুর প্রবেশ তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্যদের রক্ষার্থে। কাজেই নাটকের শুরুতে যে আপাতবিচ্ছিন্নতা রয়েছে, নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুভব করি ডায়োনাইসাস ও যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ভাবগত মিলের। নাটকে যে তিনটি চরিত্র — গ্রিক, হিব্রু এবং সিরিয়ান — তাঁরা প্রত্যেকেই এই পরিস্থিতিতে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত। কিন্তু গ্রিক ও হিব্রু দুজনেই যিশুর ঐশ্বরিক রূপের প্রমাণ চায়। একমাত্র সিরিয়ান, যাকে ইয়েটসের ভাবনায় antithetical বা subjective বলা চলে, বিশ্বাস করে যে যা যুক্তি-অতিরিক্ত বা irrational সেটিকে মেনে নিতে হবে, মেনে নিতে হবে যে একজন দেবতা মানবরূপে জন্ম নিয়ে মানুষের মতো মৃত্যুও বরণ করতে পারেন, কিন্তু অপরদিকে যেহেতু তিনি ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী, তিনি এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র অতিক্রম করে মানুষরূপে পুনরাগমন করতে পারেন তাঁর দৈব শক্তির কোনোরকম ক্ষয় না করে।

নরেশ গুহ তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন যে সুধীন্দ্রনাথ 'অনুকম্পীয় ইতিহাসের অমোঘ শক্তিতে' বিশ্বাসী ছিলেন, যেমন ছিলেন ইয়েটস, এবং সে কারণেই এই 'কাব্যনাট্যের তিনি অচিরাৎ অনুবাদ করেছিলেন।' একথা ঠিকই যে সুধীন্দ্রনাথ ইয়েটস যত্নসহকারে পড়েছিলেন এবং তাঁর নিজের সংগ্রহের ইয়েটসের কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে ধারও দিয়েছিলেন। অনুবাদের দৃষ্টিতে সুধীন্দ্রনাথ যথেষ্ট যত্নশীল এবং গ্রিক, হিব্রু ও সিরিয়ান-এর মধ্যে যে বিতর্ক সেটা তিনি খুবই দৃঢ়ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সাবলীল বাংলায়। নাটকের গানগুলিকেও তিনি যথাযথ ছন্দেই অনুবাদ করেছেন এবং দু-একটি বাঙালিয়ানা, যেমন man-কে ভদ্রলোক বলা ছাড়া, তেমন কোনও কিছুই খটকা লাগার মতো নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯৩৬ সালটি বাংলার ইতিহাসে যথেষ্ট সংকটময় সময়। এই নাটকে যে দুটি বিপরীত চরিত্রের সভ্যতার সন্ধিক্ষণের মুহূর্ত আমরা দেখতে পাই, যে সংকটের, ভীতির কথা গ্রিক বলছে, তার পেছনে কি আমাদের কোনও সংকটের চিহ্ন নেই? 'The Second Coming' কবিতায় ইয়েটস দেখিয়েছেন যে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন হবে ভয়াবহ। এবং হেরাক্লাইটাসের সেই প্রাচীন বাণীও সার্থক হবে : "God and man die each other's life, live each other's death"। জীবনের / সভ্যতার এই আন্তঃপ্রবেশকারী কালচক্র চলতেই থাকবে।

যে সংকটের কথা আমরা বলছি, সে সংকট সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের নয়। সেটি যেমনভাবে আন্তর্জাতিক তেমনি প্রযোজ্য ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হিসেবে এবং পরে কিছুটা একাই ভ্রমণ করেন (ইউরোপ, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। সালটি ১৯২৯। ততদিনে বাংলায় গান্ধীর প্রভাব কমতে শুরু করেছে, নতুন করে জেগে উঠেছে বিপ্লববাদ। ১৯৩০-এ ঘটে গেল বিখ্যাত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো স্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেও সুধীন্দ্রনাথ থেকে গিয়েছিলেন আরও কয়েক মাস এবং গিয়েছিলেন ইউরোপের কয়েকটি দেশে। সেখানে কী দেখেছিলেন ও বুঝেছিলেন সে কথা আমাদের জানা নেই, তবে অমিয় দেব একটি গূঢ় সংকেত দিয়েছেন যা অনুধাবনযোগ্য : অমিয় লিখেছেন, 'স্ত্রেসেমান ও ব্রিয়াঁর মধ্যে লোকানো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে আছে, মধ্য ইউরোপে শান্তিভঙ্গের কোনো আশঙ্কা নেই। তবে অন্বয়ব্যতিরেকী ন্যায় হয়তো অন্য কথা বলবে।'[৯] কিন্তু ইউরোপ তথা

পাশ্চাত্যভ্রমণই কি সুধীন্দ্রনাথের নতুন দৃষ্টি খুলে দেয়? চারিদিকের সংকটময় পরিস্থিতির এক সাংস্কৃতিক নির্বাণের দিকে তিনি ঝুঁকলেন। তা না হলে কেনই বা সুধীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ও প্রস্তাবে শেষমেষ *পরিচয়* পত্রিকার প্রতিষ্ঠা, যা তিনি নিপুণভাবে ১৯৩১-১৯৪৩ পর্যন্ত সম্পাদনা করলেন? ১৯৩১-এর এক সম্পাদকীয়তে *পরিচয়*-এর 'উচ্চাদর্শ'-এর কথা স্পষ্টভাবে লেখেন, পাঠককে জানান দেন কীভাবে 'বিশ্বের পরিশীলন-সম্পদের সহিত বাঙ্গালি পাঠকের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনকল্পে তাহার জন্ম'।[১০] এই উদ্দেশ্য সফল করতে সুধীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও সুশোভন সরকারের মতো সরাসরি সাহিত্য-পরিসরের বাইরের মানুষদেরও দিয়ে লিখিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে সুশোভন সরকার ১৯৩৫ সালে 'আন্তর্জাতিক সঙ্কট' এবং সেই বছরের শারদীয় সংখ্যায় 'ফাশিসমো' শিরোনামের দুটি প্রবন্ধ লেখেন। বিশ্বব্যাপী সভ্যতার সংকটের বার্তা *পরিচয়* তথা সুধীন্দ্রনাথের চেতনায় দানা বেঁধেছিল। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন যে 'ইয়োরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল পর্যায় আরম্ভ হ'লো, তার অপর সীমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। এর মধ্যেই পড়ে *পরিচয়*-এর সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল পর্যায়, ১৯৩১-১৯৩৬।'[১১] তবে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে মৌলিক কথাটি তিনি খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যা আজও সুপ্রতিষ্ঠিত : 'যা আমরা বলতে বাধ্য, তা এই যে এক অবোধ্য, নির্বোধ ও দুঃশাসন বিশ্বের বুকে মানুষের মন কেমন ক'রে অঙ্কিত ক'রে দেয় তার ইচ্ছাশক্তিকে, স্থাপন করে শব্দের প্রভাবে শৃঙ্খলা ও সার্থকতা, যা একাধারে ক্ষণকালীন ও শাশ্বত।' বুদ্ধদেবের বর্ণনায় এই প্রক্রিয়াটি 'লোমহর্ষক'।[১২] বুদ্ধদেবের এই মূল্যায়ন আমাদের দেখিয়ে দেয় সংকটময় চেতনার বহিঃপ্রকাশ কাব্যে কীভাবে ঘটে 'সংগ্রামী' এক সমকালীন ও কালজয়ী কবির ক্ষেত্রে। এছাড়াও বুদ্ধদেব লিখেছেন যে সুধীন্দ্রনাথের 'অনুবাদ (গুচ্ছ)' বর্ধিত করেছে স্বাধীন রচনার উপর তাঁর কর্তৃত্ব। আমরা *পুনরুজ্জীবন* অনুবাদের ক্ষেত্রে এই কর্তৃত্বের কথাই অন্যভাবে বলেছি, বুঝিয়েছি কর্তৃত্ব না থাকলে স্বাচ্ছন্দ্য আসাটা অস্বাভাবিক।

অবশ্য যে 'নির্বোধ' ও 'দুঃশাসন' বিশ্বের কথা বুদ্ধদেব বলেছেন সেই বিশ্বের জীবন্ত অভিজ্ঞতা থেকে জন্মায় এক ট্র্যাজিক চেতনা। ১৯৩৫-এর *পরিচয়* পত্রিকার প্রথম সংখ্যার 'পুস্তক-পরিচয়' অংশে হুমায়ুন কবীর ইয়েটসের সদ্য প্রকাশিত *Wheels and Butterflies* নাট্য সংকলনটির সমালোচনা লেখেন। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত *The Resurrection* নাটকটিও। হুমায়ুন নাটক ধরে ধরে বিশ্লেষণ করেননি ঠিকই। কিন্তু তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিকে আলোকপাত করেছেন। প্রথমতঃ, হুমায়ুন আয়ারল্যান্ডের সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে কিছুটা বিশদভাবে লিখেছেন এবং দেখিয়েছেন এই আন্দোলন কীভাবে আইরিশ জাতিসত্তাকে জাগ্রত করতে সাহায্য করেছে। হুমায়ুন লিখেছেন : 'ইংলণ্ডেও সেদিন যান্ত্রিকতার জয়জয়কার... তাহারই বিরুদ্ধে তরুণ আইরিশ চিত্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিল... আইরিশ তরুণ বলিল যে আয়ার্ল্যান্ডের মুক্তি তাহার আপনার ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন।'[১৩] কিন্তু আয়ারল্যান্ডের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অগ্রজ ভূমিকা পালন করেও ইয়েটস রোমান্টিক ন্যাশনালিজমের দ্বারা আচ্ছন্ন হননি। ইয়েটস অনুভব করেছিলেন 'জীবনের বিপুলতার' সঙ্গে 'অন্ধ নিয়তির অনিবার্য গতি', যা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল এক ট্র্যাজিক চেতনা। হুমায়ুনের এই দ্বিতীয় বিষয়টিই আমাদের বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আমরা পূর্বে অমিয় দেবের কথা উদ্ধৃত করে বলেছিলাম সুধীন্দ্রনাথ হয়তো ইউরোপের শান্তির কথা ভাবছিলেন। কিন্তু তা নয়। ১৯৪০-এ লেখা 'সংবর্ত' কবিতায় তিনি ফিরে তাকান দশ বছর আগের চেতনায়। লেখেন :

> সুবর্ণ ধারার শষ্প শ্যামল পুলিন
> উৎপিঞ্জর তারুণ্যের লাস্যময় লীলায় মুখর,

গন্ধবহসম্মার্জিত স্বারট অম্বর
দেয় ফিরে
অবরোহী সন্ধ্যার শিশিরে
অনুপূর্ব মানুষের অভ্যুদিত চিত্তের প্রসাদ;
জয়যুক্ত স্ট্রেসেমান-ব্রিয়াঁর সংবাদ।।

হয়তো তখনই
উপশয়ী সংবর্তের আড়ালে অশনি
লেলিহান করবালে ধার দিতে শুরু করেছিল
... প্রবাদের ধুয়ো ধরেছিল
তৎপূর্বে অন্তত
মুসোলীনি যুদ্ধগামী বর্বরের মত;
এবং উদ্বাস্তু ট্রটস্কি ইতিমধ্যে দেশে দেশান্তরে
ঘুরে মরেছিল... [১৪]

এরও পাঁচ বছর পরে সুধীন্দ্রনাথ আরও সংগত প্রশ্ন তোলেন '১৯৪৫' কবিতায় :

তুমি বলেছিলে জয় হবে, জয় হবে :
নাটসী পিশাচও অবিনশ্বর নয়।
জার্মানি আজ ম্রিয়মাণ পরাভবে
পশ্চিমে নাকি আগত অরুণোদয়। [১৫]

যিশুর জন্মে অরুণোদয় হওয়ার কথা, কিন্তু অনুকম্পীয় যিশুর সঙ্গে এসেছিল 'A fabulous, formless darkness' এবং 'Odour of blood when Christ was slain' (ইয়েটসের নাটকের মূল থেকে উদ্ধৃত করা হল)। দ্বিতীয় গান সুধীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন : 'মানুষী অর্ঘ্য নিমেষে শুকায়, শতমারী তার শ্রদ্ধা'। হুমায়ুন বলেছেন : 'ট্র্যাজেডির মর্মকথা দুঃখ নহে, সমস্ত প্রয়াসের অনিবার্য অবসান্যে জীবনের প্রকৃত ট্র্যাজেডি।' ইয়েটসের এই মর্মস্পর্শী অনুভূতি সুধীন্দ্রনাথেরও। তাই হয়তো *Wheels and Butterflies* তিনি সমালোচনা করতে বলেছিলেন এবং *The Resurrection* নিজে অনুবাদও করেছেন। একে 'অচিরাৎ' বলা ঠিক হবে বলে মনে হয় না। তাই হয়তো 'সংবর্ত'-এর শেষ পঙক্তিতে ইয়েটসের নাটকের শেষ কথাগুলির দূরবর্তী প্রতিধ্বনি শুনতে পাই :

নির্বাণ নভে গৃধ রাহুর গ্রাস;
তুমি অনিকেত নির্বাক নাস্তিতে;
কে জবাব দেবে, নিখিল সর্বনাশ
কোন্ অবরোহী পাতকের শাস্তিতে? [১৬]

৪

১৯৭০-এর দশকে অনুবাদ তত্ত্বে একটি নতুন ধারণার প্রবর্তন হয়। একে বলে Skopos theory। এর প্রবর্তক এক জার্মান তত্ত্ববিদ যার নাম Hans Vermeer। Vermeer-এর মতে যে কোনও অনুবাদ করার আগে অনুবাদের উদ্দেশ্য এবং ভূমিকা নির্ণীত করা প্রয়োজন; বিশেষ করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন

যে একটি অনূদিত টেক্সট টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে কী ভূমিকা পালন করবে এবং টার্গেট পাঠকের সাংস্কৃতিক পরিসরে সেই টেক্সটের মূল্য কী (Skopos শব্দটি গ্রিক থেকে নেওয়া যার ইংরেজি অর্থ purpose)। ১৯৭০ সালে বুদ্ধদেব বসু ইয়েটসের *Purgatory* (১৯৩৮) নাটকটি *প্রায়শ্চিত্ত* নামে অনুবাদ করেন। অনুবাদ না বলে বুদ্ধদেবের কথায় 'অনুলিখন' বলাই শ্রেয়। এই নাটকের মুখবন্ধে বুদ্ধদেব মূলের পটভূমিকা বদলানোর একটি 'কৈফিয়ৎ' দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে 'বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজ' আইরিশ-ইংরেজের কূট সম্পর্ক ও আইরিশ ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। মূলকে বাংলায় তুলে ধরলে অনেক পাদটীকা দিয়ে পাঠককে ভারাক্রান্ত করা হতো। তাঁর আসল উদ্দেশ্য 'ইয়েটসের প্রতিভার রশ্মি অব্যাঘাতে বিকীর্ণ' করা। কিন্তু এরপর তিনি একটি অদ্ভুত কারণ দেখিয়েছেন। ইয়েটসের প্রতিভা বাঙালি পাঠকের কাছে তুলে ধরার জন্য তিনি নাটকের পটভূমিকা স্থানান্তরিত করেছেন 'ভারতবর্ষে, বাদশাহী আমল ও সিপাহী বিদ্রোহের' সময়ে। তিনি এটি কেন করেছেন তার খুব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেননি। এই 'ভারতীয়করণের' মধ্যে দিয়ে তিনি কি এই ট্র্যাজেডির তীব্রতা বাঙালি বিদ্যৎসমাজের মনে স্থায়ী করতে চেয়েছেন? এছাড়া তাঁর মনে হয়েছে নাটকটি বহিরঙ্গে 'আইরিশ' ও 'খ্রিষ্টান' হলেও এর 'ভিতরকার কথাটি হিন্দুভাবাপন্ন'।

এই 'কৈফিয়ৎ' যেমন অনেকাংশে আমাদের কাছে এই 'অনুলিখনে'র (বুদ্ধদেবের কথায়) কারণ জানান দেয়, তেমনি অনেক কিছু আবার অন্তরালে থেকে যায়। এই নাটকটি বোঝার জন্য আমাদের ইয়েটসের আইরিশ ইতিহাস, বিশেষ করে আইরিশ অষ্টাদশ শতকের প্রতি তাঁর মনোভঙ্গি এবং আইরিশ ইতিহাসে এ্যাংলো-আইরিশদের অবস্থান, বিশেষ করে আইরিশ স্বাধীনতার পর, কিছুটা বোঝা দরকার। ইয়েটসের আইরিশ ইতিহাস ভাবনার মূলে চারটি অধ্যায় রয়েছে যাকে তিনি বলেছেন চারটি Bell। তিনি লিখেছেন : 'My historical knowledge, such as it is, begins with the Second Bell.'। তাঁর মতে এই দ্বিতীয় অধ্যায়টি আইরিশ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। সেটি হলো অষ্টাদশ শতাব্দীতে, যখন প্রোটেস্ট্যান্টরা (যাঁরা আসলে ইংরেজ) আয়ারল্যান্ডের উপর তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হল। ইয়েটসের কথায় : (T)he establishment of the protestant ascendancy. Armed with this new power, they were to modernise the social structure, with great cruelty but effectively, and to establish our political nationality... Ireland had found new masters, and was to discover for the first time in its history that it possessed a cold logical intellect.'। ইয়েটসের কথায় এটি ছিল Berkeley এবং Swift-এর মতো ভাবুকদের যুগ, বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। এই লঘুসংখ্যক মেধাজীবী সম্প্রদায়ের কথাই ইয়েটস বলেছেন এইভাবে : 'An emotion of pride and confidence at that time ran through what there was of an intellectual minority.' কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই যখন সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের প্রশ্ন কৃষক সমাজকে নতুন ধারণায় জাগ্রত করল তখন থেকেই শুরু হলো অবক্ষয়। বিশেষ করে জাতীয় মেধার। ইয়েটস লিখেছেন : 'Instead of the Protestant Ascendency with it sense of responsibility, we had the Garrison, a political party of Protestant and Catholic landowners... the returned Colonial Governor.'[১৬] বুদ্ধদেব যে ইংরেজ ও আইরিশদের মধ্যে কূট সম্পর্কের কথা বলেছেন তাঁর মুখবন্ধে তার কিছুটা আভাস আমরা উদ্ধৃত অংশে পেলাম, যদিও ইয়েটসের Protestant Ascendency (শব্দবন্ধটি লক্ষ্যণীয়) বলতে কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে আসা প্রোটেস্ট্যান্ট শ্রেণীকেই বোঝায়, যে শ্রেণী অষ্টাদশ শতাব্দীতে আয়ারল্যান্ডে তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই এই শ্রেণী তাদের গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। এর ফলে আয়ারল্যান্ডের মেধারও অবক্ষয় ঘটে। এই অবক্ষয়কেই কিছুটা পরোক্ষভাবে প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন

বুদ্ধদেব *প্রায়শ্চিত্ত*-তে, নাটকটিকে ভারতের মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) পটভূমিকায় স্থানান্তরিত করে। আমরা ইয়েটসের মূল নাটকে দেখি যে অভিজাত পরিবারের কথা বলা হচ্ছে সেখানে 'Colonial Governor'-এর উল্লেখ আছে :

Old Man : Great people lived and died in this house;
Magistrates, colonels, members of Parliament,
Captains and governors, and long ago
Men that had faught at Aughrim and the Boyne,
Some that had gone on government work
To London or to India came home to die
....
But he killed the house; to kill a house
Where great men grew up, married, died,
I here declare a capital offence. [১৮]

বুদ্ধদেবের 'অনুলিখন' দেখা যাক :

এই বাড়িতে কত জীবন, কত মৃত্যু, কত মস্ত মানুষ :
জঙ্গি বাহাদুর, পরগনার সেরেস্তাদার,
মনসবদার, মহারাজের দেওয়ান, আর যাঁরা
অনেকদিন আগে
লড়েছিল মৈশূরে, ভরতপুরে।
...
আর যে বাড়িতে
মস্ত লোকেরা বড় হয়েছেন, বিয়ে করেছেন, গঙ্গা পেয়েছেন,
তার হত্যাকারীকে আমি দেবো মৃত্যুদণ্ড! [১৯]

ইয়েটসের মূলের সঙ্গে বুদ্ধদেবের দিশিকরণের, বিশেষ করে নাটকটিকে বাদশাহী আমলে স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রে, একটি বিশেষ বৈষম্য হলো যে ইয়েটসের অভিজাত পরিবারের মানুষেরা প্রোটেস্ট্যান্ট, যাঁরা আয়ারল্যান্ডে নিজেদের শাসন কায়েম করেছিলেন, বিশেষ করে ১৬৯১-এ Aughrim ও Boyne-এর যুদ্ধের পরে। এ কথা ঠিকই যে সপ্তদশ শতকের শেষে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের যে যুদ্ধ হয় তাতে ইংল্যান্ডের দুটি প্রধান শক্তি ছিল দ্বিতীয় জেমস এবং উইলিয়ামের। দ্বিতীয় জেমস তাঁর মত পরিবর্তন করে ক্যাথলিক হয়ে যান ১৬৫৯ সালে। কাজেই আয়ারল্যান্ডের যে সৈন্যবাহিনী Aughrim এবং Boyne-এ লড়াই করে সেটি মূলত ক্যাথলিকই ছিল যদিও সেই বাহিনীতে প্রোটেস্ট্যান্টরা ছিল, যারা পঞ্চাদশ শতাব্দী থেকেই আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দা। এই প্রোটেস্ট্যান্টদের বলা হতো 'Old English' বা আদি ইংরেজ। একথাও ঠিক, যে দুটি স্মরণীয় যুদ্ধের কথা আমরা ইয়েটসের মূল নাটকে দেখি সেগুলি আয়ারল্যান্ডকে ইংরেজ আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্যেই হয়েছিল। কিন্তু যারা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল তাদের অষ্টাদশ শতকে কোন চিহ্নই প্রায় ছিল না এবং ইয়েটস এদের কথা নাটকে বলেননি। তিনি মূলত বলেছেন সেই প্রোটেস্ট্যান্টদের কথা যারা যুদ্ধে জয়লাভ করে আয়ারল্যান্ডে নিজেদের ক্ষমতা ও শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এদের সাথে মৈশূরে, ভরতপুরে লড়াই করা 'জঙ্গি বাহাদুর'-দের কীভাবে মিল

খুঁজে পাওয়া সম্ভব, কারণ এই ভারতীয় সৈনিকরা তো ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিজেদের রাজত্ব বজায় রাখার লড়াই করেছিল।

এছাড়া মূল নাটকে ইয়েটস কোনও অভিজাত আইরিশ পরিবারের নাম উল্লেখ করেননি। বৃদ্ধ মানুষটির মায়ের কথা বলতে গিয়ে ইয়েটস লিখেছেন 'She had a horse at the Curragh'। Curragh কাউন্টি কিলডেয়ারের একটি বৃহৎ সমতলভূমি যা ঘোড়ার জন্য সুপরিচিত। বুদ্ধদেব এই বৃদ্ধের মা-কে 'রায়গঞ্জের রানী'-তে পরিণত করে কী ঐতিহাসিক মিল দেখাতে চেয়েছেন তা অস্পষ্ট। এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার যে ঘোড়া থাকা সেই সময়ে আয়ারল্যান্ডে বেশ বনেদিয়ানার চিহ্ন ছিল। আইরিশ ক্যাথলিকরা অষ্টাদশ শতকে অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এমনকি পাঁচ পাউন্ডের বেশি দামের ঘোড়া তাদের রাখার অধিকার ছিল না। আইরিশ নাট্যকার Brendan Behan এই বিষয়টিকে একটু তির্যকভাবে লিখেছিলেন যে, আইরিশ প্রোটেস্ট্যান্ট মানে 'Protestant with a horse'। বুদ্ধদেবের অনুলিখনে এই সামাজিক-ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

আমরা সম্প্রতি যেসব ঐতিহাসিক অসংগতির কথা বুদ্ধদেবের অনুলিখনে দেখলাম, সেগুলি ছাড়াও আরও দু' একটি মননশীল পাঠকের নজরে ঠেকবে। যেমন ইয়েটস লিখেছেন :

Old Man : A game-keeper's wife taught me to read
A Catholic curate taught me Latin [২০]

বুদ্ধদেবের অনুলিখন :

বৃদ্ধ : আমাকে পড়তে শেখালো এক কায়েৎ গিন্নি,
এক তান্ত্রিক সাধু সংস্কৃত শেখালেন। [২১]

Game-keeper তো ব্যক্তিগত অরণ্যরক্ষক, যে অরণ্যে জমিদাররা বা রাজারা শিকার খেলতে যেতেন। যথার্থভাবে তাঁর স্ত্রী নিম্নশ্রেণির এক ব্যক্তি এবং তার বেশি লেখাপড়া জানার কথা নয়। সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণীরা কি সবাই শিক্ষিত হতেন? কিন্তু ইয়েটস যেখানে একটি শ্রেণিগত শব্দ ব্যবহার করেছেন বুদ্ধদেব কেন সেটিকে একটি জাতিগত আখ্যায় পরিণত করলেন? এই প্রশ্ন হয়তো আরও বেশি সমীচীন কারণ অনুলিখনটি ১৯৭০ সালে প্রকাশিত, যে সময়ে শ্রেণি-বিষয়ক ভাবনায় বাংলা ছিল মুখর। বুদ্ধদেব কি তৎকালীন সেই রাজনৈতিক পরিভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে চাইলেন? এতে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের কোন ইঙ্গিত আমরা পাই? এই কথাগুলিকে আমরা সূত্র হিসেবে নিচে ব্যবহার করবো। এছাড়া, সাধারণভাবে তান্ত্রিক সাধুরা সংস্কৃত শেখাবে, এরকম ধারণা খুব প্রচলিত বলে মনে হয় না। বরং অনেক ভবঘুরে সাধুরা কোথাও কোথাও সেই শিক্ষা প্রদান করতেন। কাজেই দিশিকরণের মধ্যেও এই অনুলিখনের কিছু কিছু অসংগতি চোখে পড়ে।

তাঁর কৈফিয়তে বুদ্ধদেব একথাও বলেছেন যে মূল নাটকটি 'হিন্দুভাবাপন্ন'। ইয়েটসের ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাবনার সঙ্গে পরিচয় ছিল। তিনি শ্রীপুরোহিত স্বামীকে ১৯৩০-এর দশকে দশটি উপনিষদ ইংরেজিতে অনুবাদ করতে সাহায্য করেছিলেন এবং একাধিক গ্রন্থের ভূমিকাও লিখেছেন। যদিও ইয়েটস নিজে সংস্কৃত জানতেন না। বেশ কয়েকজন ভারতীয় গবেষক ইয়েটসের ভারতীয় তথা সংস্কৃত-বৌদ্ধ সাহিত্যে উৎসাহ নিয়ে গবেষণাও করেছেন এবং এখনও করেন। বুদ্ধদেবের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় সহকর্মী নরেশ গুহ *W B Yeates - An Indian Approach* নামক গবেষণা-গ্রন্থও লিখেছেন। সেই গ্রন্থে

নরেশ গুহ ইয়েটসের সংস্কৃত সাহিত্যের ধারার সঙ্গে সম্পর্কের কথা লিখেছেন। সাধারণভাবে নাটকটিতে কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের ধারণা নিবিড়ভাবে আছে বলে প্রত্যক্ষ করা যায়। ইয়েটসের ভাষায় জয়োল্লাস-অনুতাপ-গ্লানি যুক্ত গলায় বৃদ্ধ বলছেন :

Old Man : Dear mother, the window is dark again
But you are in the light because
I finished all that consequence.
I killed that lad because he had grown up,
He would have struck a woman's fancy,
Begot, and passed pollution on.

কিন্তু এই বালককে হত্যা করেও বংশপরম্পরায় যে পাপ (ভারতীয় মতে অসবর্ণ বিবাহের ফল) তার পূর্ণ স্খলন সম্ভব নয় কারণ বৃদ্ধ বলছেন :

'Twice a murder and all for nothing' [২২]

এবং তাঁর শেষ প্রার্থনা :

O God!
Release my mother's soul from its dream!
Mankind can do no more. Appease
The misery of the living and the remorse of the death.[২৩]

বুদ্ধদেবের অনুলিখনে :

বৃদ্ধ : .... নিবিয়ে দাও
জীবিতের যন্ত্রণা আর মৃতের মনস্তাপ। [২৪]

কিন্তু যে পারিবারিক বা সাম্প্রদায়িক অধঃপতন বা অবক্ষয় এই বৃদ্ধ মানুষটির মা-কে দিয়ে শুরু হয়েছিল, যিনি নিজের আভিজাত্যকে তুচ্ছ করে এক নিম্নবর্গীয় মানুষকে বিবাহ করে এক ধরনের বর্ণসংকরের জন্ম দেন, সেই বৃত্ত থেকে কি শেষমেষ মুক্তি পাওয়া গেল? এবং এই এক ধরনের অসবর্ণ বিবাহ কি *Purgatory* নাটকের মূল বিষয় যাকে বুদ্ধদেব 'হিন্দুভাবাপন্ন' বলেছেন?

১০ই আগস্ট ১৯৩৮ সালে প্রথমবার *Purgatory* মঞ্চস্থ হওয়ার পরই ইয়েটসকে নাটকটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন : 'In my play, a spirit suffers because of its share, when alive, in the destruction of an honoured house; that destruction is taking place all over Ireland today'; এর অন্যতম কারণ হলো বর্তমান প্রজন্ম 'has lost interest in the ancient sanctities.'। আরেকটু এগিয়ে ইয়েটস বলেছেন : 'In some few cases a house has been destroyed by a mesalliance. I have founded this play on this exceptional case, partly because of my interest in certain problems of eugenics.'[২৫] এবং এই mesalliance-এর ভাবনাটি তাঁকে এই পরিবারের ট্র্যাজেডি নির্মাণ করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এছাড়া আর একটি বিষয়ও ইয়েটেসকে প্রভাবিত করেছিল। সেটি হলো জাপানি নোহ্ নাটক যার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন কেমন ভাবে মৃতরা অনুতপ্ত হয় এবং তাদের জীবনকে পুনর্নির্মাণ করে। বুদ্ধদেব এই

জাপানি ভাবধারার কথনে হিন্দুভাব খুঁজে পেয়েছেন এটি বিস্ময়কর ব্যাপার। তবে আমরা মনে করতে পারি ইয়েটসের eugenics-এর ভাবনা বুদ্ধদেবকে এই নাটকে হিন্দুভাব খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে এবং এর ফলই এই অনুলিখন। এখানে প্রশ্ন আসে বুদ্ধদেব কি নিজে engenics-এর বিষয়ে উৎসাহিত ছিলেন? সে তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে অনেক গবেষকই দেখিয়েছেন যে ১৯২০-৩০ এর দশকে ইউরোপ তথা পশ্চিম দুনিয়ায় যখন eugenics নিয়ে বেশ উৎসাহ জেগে উঠেছিল, ভারতবর্ষ সেই উৎসাহের অংশীদার ছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে অনেকগুলি eugenics society ভারতে সংগঠিত হয়। Eugenics নিয়ে বেশ গুরুগম্ভীর লেখাও সেই সময়ে অনেকে লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই ১৯২৭ সালে N. S. Phadke তাঁর *Sex Problem in India* গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছিলেন যে 'Heredity and Environments are the two mainsprings from which the quality of the race flows.'।[২৬] সুজান বেইলি দেখিয়েছেন যে eugenics মিলিত হয়েছিল Social Darwinism তত্ত্বের সঙ্গে এবং এই তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছিল প্রাচীন আর্য জাতির পুনরুত্থানের সম্ভাবনায়। C. Shankaran Nair তাঁর লেখায় আধুনিক eugenics এবং বর্ণবিভাজনের ধারণাকে একত্রিত করে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, eugenics সম্পর্কিত অনেক ধারণাই স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও তৎকালীন অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে পাওয়া যায়।

আমরা সম্প্রতি নোহ্ নাটক ও eugenics নিয়ে যে কয়েকটি কথা বলেছি, সেগুলি বুদ্ধদেবের সচেতন-অবচেতন মনের অঙ্গ বলেই আমরা অনুমান করতে পারি। তবে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। যে উত্তাল সময়ে ইয়েটসের *Purgatory* বুদ্ধদেব অনুবাদ করেছেন, সেই সময়ের নিরিখে হিন্দু ভাবধারা, eugenics, নোহ্ নাটকের অলৌকিক দিকগুলির অগ্রাধিকার বাঙালি মননে ছিল বলে বোধ হয় না। এই অনুবাদ বা অনুলিখনের মাধ্যমে বুদ্ধদেব কি তাহলে আমাদের প্রাচীন ভাবনাগুলি থেকে বৃহৎভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন, নাকি সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক ভাবনা বা আন্দোলনের অভিমুখ এড়িয়ে যেতে চাইছেন? পাঠক নিজেই নিশ্চয়ই এর যথাযথ উত্তর নির্ণয় করে নেবেন।

৫

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ইয়েটসের ভক্ত। ইয়েটসকে নিয়ে দুটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে, 'নাচের আড়ালে লুকিয়ে কে ছায়ানট' এবং 'কবির স্বদেশ'। দুটি নিবন্ধই impressionistic, 'কবির চোখে কবি'-র মতো। প্রথমটিতে অলোকরঞ্জন ইয়েটস সম্বন্ধে একটি সঠিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে ইয়েটসকে দেখেছেন প্রায় ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন, অন্তত রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন একজন কবি হিসেবে। আমাদের মনে পড়বে সেই ইয়েটসের কথা যিনি জন ও' লিয়ারির কাছে জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছিলেন, যিনি আইরিশ বিপ্লবীদের সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখতেন, যিনি ১৭৯৮-এর বিদ্রোহের শতবর্ষ উদযাপনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, যিনি এ্যাবি থিয়েটারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে জন মিলিংটন সিঙ্গ-এর *The Playboy of the Western World* নাটকের স্বপক্ষে দৃঢ়ভাবে সওয়াল করেছেন, যিনি জেমস জয়েস সমেত আরও কাউকে কাউকে ব্রিটিশ সরকারের Pension List-এর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যিনি ইস্টার বিদ্রোহে হতাশ হয়েও বিদ্রোহী শহীদদের 'Easter 1916' ও 'Sixteen Dead Men' কবিতায় বীরের মর্যাদা দিয়েছেন, যিনি আইরিশ সেনেটের সদস্য হয়েছেন, যিনি আইরিশ ব্লুশার্টসদের জন্য 'Three Marching Songs' লিখেছেন এবং পার্নেল-কে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে দেখেছেন।

কিন্তু অন্যদিকে এই অ-রাজনৈতিক ইয়েটস প্রেরণা জুগিয়েছিলেন অলোকরঞ্জনদের প্রজন্মকে, ভারতবর্ষ তথা বাংলার সংকটময় মুহূর্তে। অলোকরঞ্জন নিজের কথা স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার ক্ষেত্র পেলেন অনুবাদে। অনুবাদ করলেন আধুনিকতার (Literary Modernism)-এর দুই পথিকৃৎ কবির মহান দুটি কবিতা — ইয়েটসের ‘The Tower’ এবং টি এস এলিয়টের ‘Burnt Norton’। যে সংকটময় মুহূর্তের কথা আমরা বলছি সেটি হল ’৭০-এর দশক। অলোকরঞ্জনের ভাষায় :

> বিভিন্ন সাময়িকীতে এই সূত্রের শিল্পীর স্বাধিকার বিষয়ে যেসব লেখালেখি হয়েছিল তাদের জের অন্তত দুয়েক দশক জুড়ে থেকে গিয়েছে। সবুজ বিপ্লব (১৯৬৮) থেকে শুরু করে আদমসুমারির (১৯৭১) তোড়জোড় জমে ওঠার সন্ধিক্ষণে তথাকথিত সাধারণ লোকের চোখে আপাতসাফল্যের আড়ালে ধনী-নির্ধনের নির্মম ভেদরেখার বীভৎস চেহারাটা গোপন ছিল না। সেদিক থেকে দেখলে উৎকেন্দ্রিক রোমান্টিক মতিগতি সত্ত্বেও নকশাল আন্দোলনের বাস্তব একটি ভিত্তি ছিল।... ওই রকম সংক্রান্তির ঘোরেই এক রাত্তিরে আমি ডব্লু. বি. ইয়েটসের ‘দুর্গ’ (The Tower) কবিতাটি অনুবাদ করে বসেছিলাম। ... অপশনাক্ত কবির ওই কবিতাকে উচাটন আমার সময়ের প্রেক্ষিতে রেখে, অনেক সময় ইচ্ছাক্রমে মূল থেকে সরে এসে, শিল্পীর স্বাধীনতার কাজে ব্যবহার করাই ছিল সেদিন আমার চূড়ান্ত অভিপ্রায়।[২৭]

আপাতদৃষ্টিতে এই কথাগুলি অলোকরঞ্জনের ইয়েটসের ‘The Tower’ অনুবাদ করার কৈফিয়ৎ মনে হলেও এটিকে আমরা তৎকালীন বাঙালি কবিদের অনুবাদের manifesto হিসেবে দেখতে পারি। এই সময়ই শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সম্পাদনায় বিদেশি কবিতার অনুবাদ সংকলন *সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত* (১৯৬৮) প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলা কবিতায় এক নতুন স্ফুরণ আসে। কবিতার ভাষার প্রসার, ভাবনার ব্যাপ্তি ঘটে। কিন্তু manifesto-র কাজ সম্পূর্ণ পরিকল্পনার রূপরেখা আঁকা। অলোকরঞ্জন আরও লিখেছেন : ‘পরিশেষে এলো ইন্দিরার জারি করা ইমার্জেন্সি।’ এর সঙ্গে এল নতুন অনুশাসন এবং ‘ইন্দিরা গান্ধী তো কবিতার পরতে-পরতেই তখন অবক্ষয়ের বীজ দেখতে পাচ্ছেন। এমনকি লতাপাতা-ফুলপাখির এষণাও তাঁর কাছে তখন স্বজাতির পরিপন্থী নৈরাশ্যবাদের শামিল।’[২৮] আমরা বিস্তারিত বিশ্লেষণ না করেও এ ধারণায় উপনীত হতে পারি যে সাহিত্যলোক কখনও রাজনীতি-সমাজনীতি নিরপেক্ষ হয় না। অবিচার-ব্যভিচারের প্রতিরোধের ভাষা সাহিত্যের অন্তরালেই থাকে, সেখান থেকে নির্মিত হয় মানুষের মুক্তির সম্ভাবনার ইঙ্গিত। এই ধারণাকে আরও একটু সম্প্রসারিত করে আমরা অন্যভাবে দেখতে পাই যে অনুবাদেরও একটা politics আছে, অনুবাদ কখনোই রাজনীতি-নিরপেক্ষ কোনও ক্ষেত্র নয়। বাংলায় এমন নির্মম স্পষ্টতার জন্য অলোকরঞ্জনকে কুর্নিশ। অলোকরঞ্জনের উদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে হয়তো আমরা এতক্ষণে বুদ্ধদেব বসুর *Purgatory* অনুবাদ নিয়ে যে কথাগুলি বলেছি সেগুলির সুপ্ত তাৎপর্য কিছুটা খুঁজে পাবো।

ইয়েটসের কবিতা ছাড়া অলোকরঞ্জন এই আইরিশ কবির একটি নৃত্যনাট্য (dance play)-ও অনুবাদ করেছেন। ইয়েটসের ১৯৩৪ সালে প্রথম মঞ্চস্থ করা নাটক (*The King of the Great Clock Tower*) অলোকরঞ্জন অনুবাদ করেছেন *রাজমহলের ঘন্টামিনার* (২০২০) নামে। নাটকের বিষয়বস্তু হয়তো বাঙালি মনে তেমন দাগ কাটতে পারবে না, তবুও অলোকরঞ্জন মূলকে অনেকটাই তাঁর কাব্যিক শৈলীতে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন অনুবাদে। কিন্তু এই নাটকের ও অনুবাদেরও একটি politics আছে যা খুবই সংক্ষেপে পাঠককে জানানো প্রয়োজন। ইয়েটস প্রথমে এই নাটকটিকে গদ্যে রচনা করেন। পরে

তিনি সেটিকে নৃত্যনাট্যে পরিণত করেন। এরপর সেই গদ্য-নাটকটির নতুন নামকরণ করেন *A Full Moon in March*। সমস্যা হল, ইয়েটস যখন *The King of the Great Clock Tower*-এর গানগুলি লেখেন তিনি ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। তাই তিনি এজরা পাউন্ডকে সেগুলি দেখান। পাউন্ড ইয়েটসের উপর খুব ক্ষুব্ধ ছিলেন কারণ সেই সময় পাউন্ড ছিলেন মুসোলিনি ও হিটলারের ভক্ত, কিন্তু ডাবলিনবাসীরা তা ছিলেন না। সেটি থেকে পাউন্ডের মনে হয়েছিল তারা সব 'reactionary'। পাউন্ড ইয়েটসের পুঁথিটি নিয়ে রাগান্বিত হয়ে চলে যান এবং পরের দিন ফেরত দেন মন্তব্যস্বরূপ একটি শব্দ লিখে — 'Putrid'। এই ঘটনাটি ইয়েটস গোপন করেননি; বরং *The King of the Great Clock Tower, Commentaries and Poems* (১৯৩৪) সংকলনটির মুখবন্ধে এই ঘটনাটি (Putrid শব্দটি বজায় রেখে) প্রকাশ করেন। না, তিনি কোনও মুখোশের আড়ালে পাউন্ডের সমালোচনা করেননি। কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। অনেকেরই মনে পড়বে সৌরীন্দ্র মিত্রের *খ্যাতি-অখ্যাতির নেপথ্যে* গ্রন্থের কথা। সেই গ্রন্থে সৌরীন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইয়েটসকে ক্ষুদ্র করে দেখিয়েছেন এবং পাউন্ডের এই 'Putrid' মন্তব্যটি ইয়েটসের 'The Tower' কবিতার উপর আরোপ করেছেন। যে কোনও গবেষকই মূল বা প্রামাণিক টেক্সট দেখেই কাজ করেন। ইয়েটসের নিজের স্বীকারোক্তি কি এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়? সৌরীন্দ্র মিত্র স্টিফেন স্পেন্ডারের আত্মজীবনীকে তাঁর ধারণার সূত্র হিসেবে দেখেছেন। সেই ভুল সংশোধিত হওয়ার হাজারো প্রামাণিক তথ্য সেই সময় ছিল যার মধ্যে ইয়েটসের স্বীকারোক্তিই মৌলিক ও অগ্রগণ্য। এছাড়া, কোনও অপরিণত সমালোচকও ইয়েটসের 'The Tower'-কে 'putrrid' বলবে না কারণ এই কাব্যগ্রন্থেই রয়েছে ইয়েটসের পরিণত বয়সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি। আসলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমালোচনার সংশোধন করার কোনও ইচ্ছে থাকেই না। অনিচ্ছাকৃত ভ্রম বা ভ্রান্তির সংশোধন সর্বকালেই হয়। ইয়েটসের বিষয় থেকেই একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। Conor Cruise O'Brien ছিলেন আইরিশ ডিপ্লোম্যাট ও সমালোচক। ১৯৬৫ সালে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন ইয়েটসকে নিয়ে এবং সেই প্রবন্ধে তিনি ইয়েটসকে এই বলে দোষারোপ করেন যে তাঁর মধ্যে ফ্যাসিস্ট প্রবণতা ছিল। কিন্তু বহুদিন পড়াশোনা করার পর এবং ইয়েটস-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি তাঁর মত বদলান এবং ১৯৮৮-র এক প্রবন্ধে তিনি তাঁর ভুল স্বীকার করেন। O'Brien লেখেন, 'the passage as it stands is unjust to Yeats'[৩০]।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'The Tower' যে সময়ে অনুবাদ করেন প্রায় কাছাকাছি সময়ে সৌরীন্দ্র মিত্রের ভাষ্য পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল। এও এক পরিহাস যে ইয়েটসের অন্য কোনও নাটক না বেছে, অলোকরঞ্জন *The King of the Greak Clock Tower*-কেই অনুবাদের জন্য বেছে নেন। অনুবাদের মহিমায় ধুয়ে গেল 'Putrid'-এর গ্লানি। বাঙালি কবি নিঃশব্দে এবং (হয়তো) নিজের অজান্তেই বাঙালি সমালোচকের প্রতিউত্তর দিলেন। এই কারণেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের প্রতি বর্তমান প্রবন্ধকার চির-কৃতজ্ঞ থাকবে।

তথ্যসূত্র :

১। Andre Lefevere, *Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame* (London & New York ` Routledge, 1992), p.41.

২। Walter Benjamin, *Illuminations*, tr Harry Zoha, ed & intro. Hannah Arendt (1973; London ` Fontana, 1992), p.72.

৩। John Hookham Frere, 'Mitchell's Translations of Aristophanes', *The Quarterly Review,* Vol 23, Issue 46, 1820, p.481.

৪। W. B. Yeats, *Explorations* (London : Macmillan, 1962), p.254.

৫। W. B. Yeats, *The Collected Works of W B Yeats, Vol II, Plays* (New York : Scribner, 2001), p.694-95. (এর পর থেকে *Collected Works II*)

৬। W. B. Yeats, *Collected Works II,* p.690.

৭। W. B. Yeats, *The Collected Works of W B Yeats, Vol III, Autobiographies* (New York : Scribner, 1999), p.410

৮। Rabindranath Tagore, Tagore's Letter to W B Yeats, dt, 26 January 1913, Rabindra Bhavana Archive, File No 442.

৯। অমিয় দেব, *সুধীন্দ্রনাথ দত্ত* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১) পৃ:৩৪।

১০। .... , উদ্ধৃতি, তদেব, পৃ:৪২।

১১। বুদ্ধদেব বসু, 'ভূমিকা', *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ* (কলকাতা : দে'জ, ২০১৭), পৃ: দেওয়া নেই।

১২। ঐ তদেব, পৃ: দেওয়া নেই।

১৩। হুমায়ুণ কবীর, *পরিচয়,* শ্রাবণ ১৩৪২, পৃ:১৫৩।

১৪। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ* (কলকাতা : দে'জ, ২০১৭), পৃ:২০৪।

১৫। ঐ , তদেব, পৃ:২০৯।

১৬। ঐ , তদেব, পৃ:২১১।

১৭। W. B. Yeats, *The Variorum Edition of the Poems of W. B. Yeats, eds. Peter Altt & Russel K Alspach* (London : Macmillan, 1957)), p.832-833.

১৮। W. B. Yeats, *Collected Works Vol II,* p.539.

১৯। ডব্ল্যু. বি. ইয়েটস, *প্রায়শ্চিত্ত ও পুনরুজ্জীবন,* অনুবাদ (যথাক্রমে) বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ভূমিকা, নরেশ গুহ (কলকতা : প্যাপিরাস, ১৯৯৬) পৃ:১৬।

২০। W. B. Yeats, *Collected Works Vol II,* p.539.

২১। ডব্ল্যু. বি. ইয়েটস, *প্রায়শ্চিত্ত,* পৃ:১৬।

২২। W. B. Yeats, *Collected Works Vol II,* p.543.

২৩। W. B. Yeats, ibid, p.544.

২৪। ডব্ল্যু. বি. ইয়েটস, *প্রায়শ্চিত্ত,* পৃ:২৩।

২৫। W. B. Yeats, *Collected Works Vol II,* p.918.

২৬। N. S. Phadke, *Sex Problem in India (Bombay : D. B. Taraporevala, 1927),* p.127.

২৭। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দুটি মহাকবিতা (কলকাতা; এবং মুশায়েরা, ২০০৬) পৃ:১৪।

২৮। ঐ , তদেব, পৃ:১৫।

২৯। Conor Cruise O'Brien, *Passion and Cunning : Essays on Nationalism, Terrorism & Revolution* (New York & London; Simon and Schuster, 1988), p.2.

৩০। সৌরীন্দ্র মিত্র, *খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে* (কলকাতা : আনন্দ, ১৯৯৫), পৃ:৭৬।

শীর্ষেন্দু মজুমদার : প্রাবন্ধিক এবং বোলপুর কলেজের ইংরেজি বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর।